সাধারণ লিডারশিপ পিরামিডের মাথায় বসে ক্ষমতায়নের কথা বলে। ছাদে বসে চোখ কুঁচকে দেখে সব ঠিকঠাক চলছে কিনা। অন্যদিকে, এক সার্ভেন্ট লিডার ক্ষমতা ভাগ করে নেন তাঁর অধস্তনদের সঙ্গে। যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেন তাঁদের প্রয়োজন, তাঁদের প্রত্যাশাকে তিনি এগিয়ে রাখার চেষ্টা করেন সবার আগে, নিজের চাহিদাভরা কৌটোটার থেকে অনেক এগিয়ে। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, ক্ষমতার পিরামিডের উপরে বসে নয়, একদম নীচের সিঁড়িতে বসে দলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে কাজ করাটাই একজন সত্যিকারের সার্ভেন্ট লিডারের পরিচয়

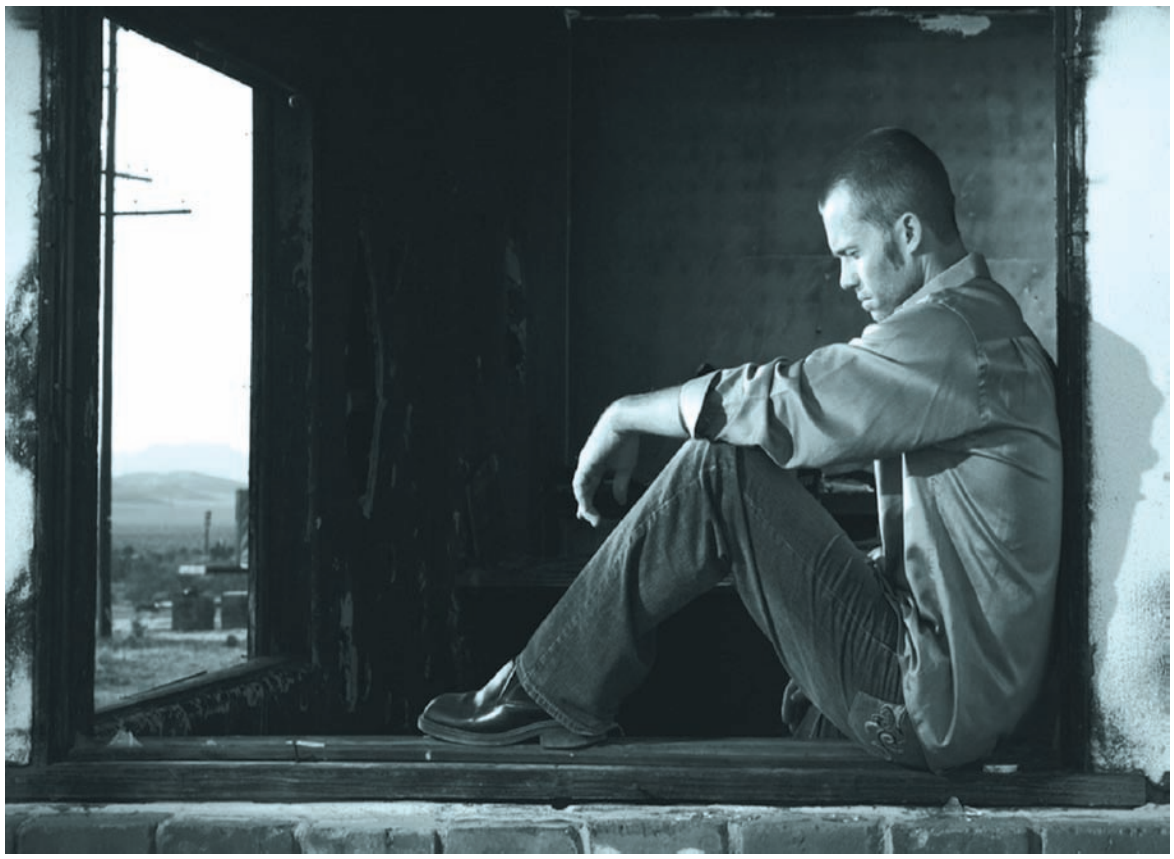

পুরীর সমুদ্রের ধারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, হোমরাচোমরা গোছের। রাশভারী। সমুদ্রসৈকতের পাশ গিয়ে যে টানা রাস্তাটা চলে গিয়েছে, সেখানে একটা রোবট বসানো ছিল। রোবটশরীর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছিল লাল-নীল আলো। সেই যন্ত্র নাকি দশ টাকার বিনিময়ে বলে দিতে পারে রক্তমাংসের কারও ভূত-ভবিষ্যৎ। আসলে কিছুই না, কয়েকটা রেকর্ড ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হেডফোনে বাজানো হয়। যাই হোক, ভদ্রলোক টাকা দিয়ে হেডফোন পরলেন। যন্ত্রবাণী শুনে খুব মুষড়ে পড়ে কান থেকে হেডফোনটা টান মেরে ফেলে দিলেন। রোবট-মালিককে বললেন, 'ওয়ার্থলেস। জীবনের বেস্ট অ্যাচিভমেন্টটাই তো বলল না।' রোবটওয়ালা চুপ। ভদ্রলোক জামার আস্তিনটা একটু গুটিয়ে, রিমলেস ফ্রেমটাকে তর্জনী দিয়ে নাকের উপরে মৃদু ঠেলে আয়েসি চালে বললেন, 'টিল ডেট ছেষট্টি জনের চাকরি খেয়েছি। মাই টার্গেট ইজ টু টাচ দ্য সেঞ্চুরি। আমি একটা কোম্পানির জিএম।'

জিএম সাহেবের চেহারাটা মনে নেই আর। কিন্তু কথাগুলো আজও মনে আছে। তখন স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। পরে কাজের জগতে ঢুকে দেখেছি, এমন জিএম-রা ছড়িয়ে আছেন হাজারে হাজারে। চাকের উপরে ভনভন করা চকচকে মৌমাছির মতো। যাঁরা তাঁদের সোনার হুল শানিয়ে যান নিয়ম করে। আর লক্ষ লক্ষ বেচারা সাবঅর্ডিনেট, অধস্তন, তাদের সারা শরীরে, মননে মেখে ঘুরে বেড়ায় সেই হুলের মোজাইক। ক্রমাগত খারাপ ব্যবহার, অপমান আর দিনের পর দিন লোকজনদের, নিজের টিম মেম্বারদের হেয় করতে করতে ওই জিএম-রা বুঝতেই পারেন না, রাতের অন্ধকারেও তাঁদের চোখগুলো কখন যেন জ্বলতে শুরু করেছে। যেদিন সেটা বোঝেন, আত্মশ্লাঘা হয়। এই শ্লাঘা মানচিত্রের একূল ওকূল ছাপিয়ে যায়। সমস্যাটা দুনিয়াজোড়া।

একটু মেলোড্রামাটিক মনে হতে পারে, বিশ্বাস করতেও কষ্ট হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর আধুনিকতম জেলখানার নাম কর্পোরেট অফিস। নিয়ন আলো, এলইডি ব্র্যান্ডিং, 'স্টেট অফ দ্য আর্ট ওয়ার্কস্টেশন', কিউবিক্লের মোড়কে সেখানে ঘোলাটে স্পাইনাল ফ্লুইডের মতো বয়ে চলে এক মন খারাপের নদী, পৃথিবীর এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি। আর এই স্রোতে কিলবিল করেন কিছু বিপন্ন, বিষণ্ণ অ্যামিবা - যাঁরা চুক্তিপত্র সই করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মেরুদণ্ডগুলোকেও কোম্পানির কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছেন, অনন্যোপায় হয়ে। চার্লি চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইমস'-এর কারখানার সেই স্যুট টাই পরা প্রোডাকশন ম্যানেজারকে মনে পড়ে? যিনি ক্যামেরায় চোখ রেখে দেখে ছড়ি ঘোরাতেন? আজকের দিনের ঝাঁ চকচকে অফিসে এই সিসিটিভি ক্যামেরার বিশ্বজোড়া চোখ। একমাত্র ওয়াশরুমই হয়তো বন্ধ দরজার আড়ালে আব্রু বাঁচায়, আজও। তবে শুধুমাত্র কর্পোরেট অফিসগুলোকেই বা একা দোষ দিই কেন? যাঁরা সেলস-এ কাজ করেন, বিশেষ করে একটু নিচু তলায়, তাঁদের কাউকে কোনওদিন জিজ্ঞেস করে দেখবেন, 'ভালো আছ ভাই?' তাঁদের চোখের দৃষ্টি, বডি ল্যাঙ্গোয়েজ অনেক না বলা কথা বলে উঠবে।

শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশন লাগোয়া ফুটপাত। শেষ মেট্রো ঢুকেছে সবে। রাত সাড়ে দশটা। এক ওয়াটার পিউরিফায়ার কোম্পানির সেলসম্যান তাঁর সামনে মেশিনটি সাজিয়ে তখনও লড়ে যাচ্ছেন সমানে। মেট্রো থেকে বেরোনো ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎই একজন ওই ছেলেটির সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিতনা সেল হুয়া?' ভদ্রলোক আমার পাশেই বসেছিলেন মেট্রোতে। দামি পারফিউম আর দামি হুইস্কির একটা মেশানো গন্ধ পাচ্ছিলাম তখন থেকেই। ওঁর মোবাইলে ইউটিউব ছিল। স্ক্রিনে ডিজে মিক্স। কানে ব্লুটুথ ইয়ারফোন। সেলস-এর ছেলেটা মিনমিন করে বলেছিল, 'বহুত কোশিস কিয়া থা স্যার। বাট আজ সেল হুয়া নেহি।' এর পরেই খাদক, খাদ্যের কলার চেপে ধরে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'কাল থেকে তোমার আর দরকার নেই।' ফাঁসির দড়ি টানার মতো এক টানে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন ছেলেটার গলায় ঝুলনো কোম্পানির আইডেন্টিটি কার্ড। একটা পাঁচ অক্ষরের অশ্রাব্য গালাগালি। তারপর দুর্বাসার হুংকার। 'চল, তেরা নৌকরি হাম খা লিয়ে। গেট লস্ট।' ঘড়ির কাঁটা তখন পৌনে এগারোটা ছুঁই ছুঁই। সেলসবয়টি তার বসের পা দু'টো আঁকড়ে ধরেছিল। ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে গিয়েছিল কয়েক ফুট, রাস্তার কোনও বেওয়ারিশ পাথর পায়ের ধাক্কায় যে ভাবে এগোয়। এক রগড়প্রেমী লোক এরই মধ্যে সুযোগ বুঝে গুটখার গরম পিক ফেলে দিয়েছিল ঝকঝকে ওয়াটার পিউরিফাইং মেশিনটিতে। জমে গিয়েছিল ফোকটের নাইট শো।

পাকেচক্রে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পর ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়তে হয়েছিল। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার পেপারে একটা প্রশ্ন হট ফেভারিট ছিল। 'হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটউইন এ ম্যানেজার অ্যান্ড এ লিডার?' উত্তরের প্রথম পয়েন্টটাই ছিল, একজন লিডারের অনুগামী হয়, কিন্তু একজন ম্যানেজারের তা হয় না। ম্যানেজারের জন্য লোকে কাজ করে, ওই 'কাজ'টুকুই করে, কিন্তু লিডারের দেখানো পথ লোকে অনুসরণ করে। ইচ্ছে করেই লিডার আর ম্যানেজারের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করছি না। 'নেতা' কথাটা এই প্রেক্ষিতে খুব বাজে শোনায়। সোজা কথায় বলতে গেলে, ম্যানেজার জাতে উঠলে তবেই লিডার হন। এখানে 'জাত' মানে কিন্তু প্রমোশন নয়! ভিজিটিং কার্ডের ডেজিগনেশন দু'জনেরই এক। কিন্তু তাদের সত্তার মধ্যে অনেক তফাৎ থেকে যায়।

মানবজমিন আবাদ করে সোনা ফলাতে পারে ক'জন? জীবনের বারো আনাই তো কাটিয়ে দিই কাউকে না কাউকে রিপোর্ট করে। বৃথা এই রিপোর্ট। কোথায় যেন পড়েছিলাম, অফিসে আমরা যে আট ঘণ্টা কাজ করি তার উদ্দেশ্য একটাই - দিনের বাকি ষোলো ঘণ্টা যেন নিজের মতো করে কাটাতে পারি, ভাল ভাবে। নিজেকে দেখুন, নিজের চারপাশের লোকজনদের দেখুন। যত দিন যাচ্ছে, মনোবিদদের চেম্বার উপছে পড়ছে অবসাদগ্রস্ত মানুষের ভিড়ে। এর বেশিরভাগই কর্মজীবনের অবসাদ। আর এই অবসাদের জন্য অনেকটাই দায়ী খারাপ, অমানবিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। ব্যাড বস্। মনোবিদরা ট্র্যাঙ্কুলাইজার দিচ্ছেন, ডিপ্রেশন কমানোর জন্য আরও ওষুধ দিচ্ছেন নানারকম। কিন্তু তাঁরা তো বস্ পাল্টানোর নিদান দিতে পারছেন না। এ নৌকো থেকে অন্য নৌকোতে উঠলেই জল যে শান্ত হবে, তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই।

ঠিক কী কী 'গুণ' থাকলে একজন ব্যাড বস্ হয়ে ওঠেন? ম্যানেজমেন্টের থিওরি এ নিয়ে অনেক কথা বলে। নিজের টিমের লোকদের যাঁরা ঠিকঠাক পথ দেখাতে পারেন না, যাঁদের কাজকর্মের মধ্যে কোনও পরিকল্পনা নেই, কোনও কাজ কেন করতে বা করাতে হচ্ছে এ নিয়ে যাঁদের স্বচ্ছ ধারণা নেই, যাঁরা কোনও কাজে সাফল্য পেলে ক্রিমটা একা খান কিন্তু অসফল হলে তার যাবতীয় দায় চাপিয়ে দেন অধস্তনদের উপর। থিওরি বলে, খারাপ বস্ সাধারণত হয়ে থাকেন এঁরাই। তবে বইতে তো সব কথা লেখা থাকে না। লেখা যায়ও না। এখন তো পারফরম্যান্স বেসড অ্যাপ্রাইজালের যুগ। বেসরকারি সংস্থা তো বটেই, সরকারি অফিসগুলোতেও নাকি এমন ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে খুব শিগগিরিই। সারা বছর যেমন কাজ করবেন, ইনক্রিমেন্টও মিলবে ঠিক তেমন। তবে মুশকিলটা হল, বহু জায়গাতেই এখন অ্যাপ্রাইজালের রেটিং তোষামোদ করার ক্ষমতার সঙ্গে সমানুপাতিক। সোজা কথায়, ফেলো কড়ি মাখো তেলের বদলে এখন ফেলো তেল, মাখো কড়ি। এই কালচারে যাঁরা মদত দেন, পুষ্ট করেন, তাঁরা তো ভাল বস বা সুপারভাইজার হতে পারেন না কোনওভাবেই।

কলকাতারই এক বহুজাতিক সংস্থার এক সিনিয়র ম্যানেজারের কথা জানি, যিনি তাঁর বস্ অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজারের গাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, ভাল অ্যাপ্রাইজাল রেটিংয়ের আশায়। চাকরির প্রথম দিন থেকেই 'ইয়েস বস্' কর্মী ছিলেন। ফলে বসের প্রিয়পাত্র হতেও বেশি সময় লাগেনি। এ হেন বসের গাড়িটা যেদিন খারাপ হয়ে যায় রাস্তায়, সেই সিনিয়র ম্যানেজার ফোন পাওয়া মাত্র মেকানিক নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন। এজিএম ভীষণ খুশি হয়েছিলেন সেদিন। সে বছর সিনিয়র ম্যানেজারবাবু প্রমোশন পান। একই পাড়ায় বাড়ি হওয়ার সুবাদে আজকাল উনি প্রতি রবিবার বসের গাড়িটা ধুয়েও দিয়ে আসেন। আশায় আছেন, এ বারও প্রমোশন হবে। এজিএম সাহেবও নাকি এমনটাই কথা দিয়েছেন। এমন ক্ষেত্রে সারা বছর কেউ কেমন কাজ করল তা মাপজোকের মধ্যে আসে না। 'কাজের কাজ'টা কেমন হল সেটাই হক কথা। একটি নামজাদা সংবাদপত্রের এক কর্মী তোষামোদকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্পাদকের বাজারটা তিনি করে দিয়ে আসতেন ফি রোববার। বারান্দায় থলেটা রেখে বলতেন, 'আপনি লিখুন স্যার। এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তবে আমার ব্যাপারটা একটু দেখবেন স্যার'। একটি বেসরকারি ব্যাংকের জনৈক ডিভিশনাল হেড পথ দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন সম্প্রতি। চিকিৎসকরা বলেছিলেন, রক্ত লাগবে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে খবর ছড়াতেই নার্সিংহোমে তাঁর অধস্তনদের মধ্যে রক্ত দেওয়া নিয়ে প্রায় হাতাহাতি হয়ে যায়। প্রত্যেকেই নাকি দিতে চেয়েছিলেন। অনেকে জানতেনও না, ব্লাডগ্রুপ কী। যাঁরা রক্ত দিতে পারেননি, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার সাময়িক ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, আইসিইউতে শুয়ে যাঁদের রক্ত টেনেছেন বস, পারফরম্যান্স অ্যাপ্রাইজালের সময়ও তিনি তাঁদেরকেই টানবেন। মজার ঘটনা হল, সুস্থ হওয়ার পরেই অন্য